সূরা আল আসর

আয়াত ৩ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَالۡعَصۡرِ ۝١ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ۝٣

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. সময়ের শপথ, ২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত) আছে, ৩. সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে (নেক কাজের) তাগিদ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মাত্র তিনটি আয়াতের সমাহার এই ক্ষুদ্র সূরাটিতে মানব জীবনের জন্যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বিদ্যমান। এ জীবন বিধানের রূপরেখা, অবিকল ইসলাম যেমন মানব জীবনের জন্যে হওয়া উচিত বলে প্রত্যাশা করে, তেমনি। অত্যন্ত স্পষ্ট, নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে ঈমানী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার বৈশিষ্টগুলোকে তার সর্বব্যাপী ও বিরাট মূলতত্ত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে এই সূরায়। সত্যি বলতে কি, এ সূরাটি তার শেষ আয়াতে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়ে গোটা ইসলামী শাসনতন্ত্র ও সংবিধান রচনা ও প্রতিষ্ঠিত করেছে, মুসলিম উম্মাহর জাতিসত্ত্বার বর্ণনা দিয়েছে, তার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছে। এটি এমন এক অলৌকিক কীর্তি, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সম্পাদন করতে সক্ষম নয়।

যে মহাসত্যক এই সূরা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরে, তাহলো সকল যুগে ও সর্বকালে মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে একটিমাত্র জীবন যাপন পদ্ধতি ছিলো এবং আছে, যা লাভজনক ও উপকারী এবং যা মানুষের মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। যে জীবন যাপন পদ্ধতির সীমারেখা এই সূরায় অংকিত হয়েছে এবং যে জীবন ব্যবস্থার রূপ কাঠামো এই সূরায় দেয়া হয়েছে, সেটিই উল্লেখিত জীবন ব্যবস্থা। এর বাইরে যতো রকমের জীবনাচার ও জীবন পদ্ধতি আছে, তার সবই সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক।

তাফসীর

'মহাকালের শপথ, মানুষমাত্রই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, সত্যের সপক্ষে মানুষকে উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের সপক্ষে উপদেশ দিয়েছে।'

সেই জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ঈমান, সৎকাজ, সত্যের উপদেশ ও ধৈর্যের উপদেশ-এই চারের সমষ্টি।

বৈশিষ্টমণ্ডিত ঈমান

এখানে আমরা ঈমানের ফেকাহ শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা দিচ্ছি না। আমরা ঈমানের স্বরূপ ও মানব জীবনে তার মূল্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করছি।

যে মহান স্রষ্টা খোদ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার থেকেই গোটা সৃষ্টির উৎপত্তি হয়েছে। এ কারণেই সেই উৎস থেকে উৎসারিত অন্যান্য সৃষ্টিজগতের সাথে, এই জগতকে পরিচালনাকারী ফেরেশতা ও আল্লাহর অনুগত অন্যান্য শক্তির সাথে এবং এই জগতে সঞ্চিত শক্তিসমূহের সাথে তাকে সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন করতে ও রক্ষা করতে হবে। আর এ কারণে তাকে তার নিজ সত্ত্বার ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে জগতের বিশাল প্রান্তরে স্থান নিতে হবে। তার দুর্বল শক্তির সংকীর্ণ সীমানার ভেতর থেকে বেরিয়ে অজানা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিশালত্বের দিকে তাকে যাত্রা করতে হবে। তার ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে অনন্তকালীন জীবনের দিকে যাত্রা করতে হবে-যে জীবনের সীমা পরিসীমা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। (লেখকের 'ইসলাম ও বিশ্বশান্তি' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

এই সংযোগ ও সম্পর্ক মানুষকে শক্তি, সামর্থ ও স্থিতি দান করে, তাছাড়াও তাকে জগত কিছু সম্পদ ও সৌন্দর্য প্রদান করে থাকে। অনুরূপভাবে তার আত্মা আল্লাহর কিছু সৃষ্টির আত্মার সহানুভূতি লাভ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হবে, ইহকালীন জীবন আসলে মানুষের জন্যে প্রতিষ্ঠিত একটি খোদায়ী মেলায় পরিভ্রমণের শামিল। পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বক্ষণ এই মেলা বিদ্যমান। এই জীবন একটা বিরাট সৌভাগ্য, একটা নির্মল আনন্দ এবং জীবন ও জগতের সাথে সখ্য, ঠিক যেমন বন্ধুর সাথে বন্ধুর সখ্য হয়ে থাকে। এই সখ্য ও মৈত্রী এমন একটি দুর্লভ প্রাপ্তি যার সমতুল্য আর কোনো প্রাপ্তি নেই এবং এর অভাব এমন শূন্যতা ও ক্ষতি, যার সমতুল্য আর কোনো ক্ষতি নেই।

ঈমানের বৈশিষ্ট্যগুলো খোদ্ মানবতারই বৈশিষ্ট্য। এগুলো খুবই সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

প্রথম বৈশিষ্ট্য

ঈমানের বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য জিনিস হলো এক আল্লাহর এবাদত। এটি মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্য সত্ত্বার দাসত্ব থেকে উর্ধে উন্নীত করে। তাকে সকল সৃষ্টির সাথে সমতা দান করে। কাজেই সে কাউকে কুর্নিশ করে না। আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নোয়ায় না। এখান থেকেই শুরু হয় মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতার জয়যাত্রা। এ জয়যাত্রা শুরু হয় তার বিবেক থেকে এবং জগতের বাস্তব সত্য থেকে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই, আর কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং এই চিন্তাধারা থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বতস্ফূর্ত উৎপত্তি ঘটে। কেননা এটাই একমাত্র যৌক্তিক সত্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক- মনে এই বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন। তাঁর সত্তার এই দিকটি থেকেই মানুষ নিজের মতাদর্শ, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, বিচার-বিবেচনার মানদণ্ড, আইন ও বিধান এবং আল্লাহর সাথে, সৃষ্টির সাথে ও মানুষের সাথে তার সম্পর্ক কী হবে, তা গ্রহণ করে। সুতরাং জীবন থেকে স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদ ও স্বেচ্ছাচারিতা উৎখাত হয়ে যায়। তার জায়গায় স্থান নেয় আইন ও ন্যায়নীতি। মোমেনের চিন্তা-চেতনায় স্বীয় আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার মূল্য বেড়ে যায়, তার মর্যাদা জাহেলী চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের ওপরে এবং পার্থিব সম্পর্ক-সম্বন্ধ থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধের ওপরে উন্নীত হয়, যদিও সে হয় একজন একক

ব্যক্তি। কেননা সে জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করে সরাসরি আল্লাহ তায়ালা থেকে প্রাপ্ত চিন্তাধারা, আদর্শ, মূল্যবোধ ও বিচার-বিবেচনার বলে। কাজেই সে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা শক্তিমান এবং সকলের সম্মান ও আনুগত্যের পাত্র হয়ে থাকে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্কের স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা এবং প্রভুত্বের স্থান ও দাসত্বের স্থান যথাযথভাবে প্রকাশিত হওয়া। এরই বদৌলতে এই নশ্বর সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষ অমর ও অক্ষয় সত্যের সাথে সরাসরি ও কোনো জটিলতা ছাড়াই সংযুক্ত হয়। এরই কল্যাণে তার হৃদয় জ্যোতির্ময় হয়, আত্মা পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয় ও আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়। সেই সাথে সন্দেহ ও সংশয়ের উচ্ছেদ ঘটে, ভীতি উদ্বেগের, উত্তেজনা ও অরাজকতার উচ্ছেদ ঘটে ও সমাপ্তি হয় পৃথিবীতে অনধিকার অহমিকা ও অহংকারের এবং আল্লাহর বান্দাদের ওপর অবৈধভাবে ও প্রতারণার মাধ্যমে আধিপত্য চিন্তার।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধানের ওপর অচল-অটলভাবে টিকে থাকা। সুতরাং কল্যাণ কোনো ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক জিনিস বা দুর্ঘটনা হিসাবে আসে না, বরং বিভিন্ন উপাদান থেকে তার জন্ম হয়, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গন্তব্য অভিমুখে তা চলে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বান্দারা সহযোগিতা করে। কাজেই মুসলিম দল বা সমাজের একটি ঐক্যবদ্ধ স্বচ্ছ লক্ষ্য থাকে, একটি সুনির্দিষ্ট পতাকা থাকে, আর পরবর্তী প্রজন্মগুলো এই অটুট বন্ধনের সাথে একাত্ম হয়ে যায়।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য

পঞ্চম বৈশিষ্ট হচ্ছে, আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদার অধিকারী হওয়ার প্রত্যয়। নিজেকে নিজের বিবেচনায়ও সে উন্নত রাখে। আর আল্লাহ তায়ালা যে উচ্চ মর্যাদায় তাকে আসীন করেছেন, তা থেকে সে নিজেকে নিচে নামায় না। এ জন্যে তার বিবেকে পর্যাপ্ত লজ্জা ও শালীনতাবোধ জন্মে। বস্তুত মানুষ নিজের ব্যাপারে যতো উচ্চ ধারণা পোষণ করে, এটি তার মধ্যে উচ্চতম। সে আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল মতাদর্শ মানুষকে তার নিজের দৃষ্টিতেই হীন ও ইতর বানিয়ে দেয়, তাকে অত্যন্ত তুচ্ছ জাত বলে দেখায় এবং তার মধ্যে ও ফেরেশতাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। এটা আসলে এমন ধারণা বা বিশ্বাস, যা তাকে নিম্নস্তরের সৃষ্টিতে পরিণত করে, যদিও একথা তারা স্পষ্ট করে বলে না।

এ বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ডারউইনবাদ, ফ্রয়েডবাদ ও মার্কসবাদ মানব জাতির ওপর আপতিত জঘন্যতম আপদও অপবাদ। এ সব মতবাদ মানুষকে এই ধারণা দেয় যে, প্রত্যেক নীচতা, হীনতা, নোংরামি ও দুষ্কৃতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত জিনিস। এতে অস্বাভাবিক ও নতুনত্ব কিছুই নেই। এতে লজ্জারও কিছু নেই। অথচ আসলে তা মানবতার বিরুদ্ধে একটা নিন্দনীয় নিকৃষ্ট অপরাধ।

আর আবেগের পরিচ্ছন্নতা এই অনুভূতির প্রত্যক্ষ ফল যে, আল্লাহর কাছে মানুষ সম্মানিত ও মর্যাদাবান। তিনি বিবেকের তদারকী করেন এবং তার সকল গুপ্ত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত। যে সরল সোজা মানুষ এখনো ফ্রয়েড ও কার্লমার্কস প্রমুখের মতবাদ দ্বারা বিকৃত হয়নি, সে তার অন্তরে লুকানো কোনো খারাপ ইচ্ছা সম্পর্কে অন্য কোনো মানুষ অবগত হোক, তা কখনো পছন্দ করবে না। মোমেন অনুভব করে যে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর প্রতিটি মুহূর্তে দৃষ্টি রাখছেন। তাই সে মনে করে যে, তার চিন্তা ও অনুভূতিকে পবিত্র রাখাই সমীচীন।

ঈমানের নৈতিক চেতনা হচ্ছে স্নেহময়, পরম ধৈর্যশীল মাবুদ রয়েছেন, যিনি অন্যায়কে ঘৃণা ও ন্যায়কে পছন্দ করেন এবং চোখের কুদৃষ্টি ও অন্তরে লুকানো ইচ্ছা পর্যন্ত জানেন। সে কথা বিশ্বাস করলেই মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা জন্মে।

স্বাধীন ইচ্ছা ও সামষ্টিক তদারকী থেকেও একটি গুণের জন্ম হয়। মোমেনের অনুভূতিতে আমরা এ গুণটি সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকি। এটি হচ্ছে সতর্কতা, স্পর্শকাতরতা, জাগৃতি, গাম্ভীর্য ও আন্তরিকতা এবং প্রজ্ঞা ও কুশলতা। এটি শুধু ব্যক্তিগত গুণ নয়। এটি একটি সামষ্টিক গুণও বটে। এটি নিজের একটি কল্যাণময় গুণ, তদুপরি গোটা মানব জাতির জন্যেও এবং আল্লাহর কাছেও এর গুরুত্ব রয়েছে। যখনই মোমেন কোনো কাজের উদ্যোগ নেয়, তখনই এই গুণাবলী অনুভব করে। ফলে নিজের কাছেও সে বড় এবং পা বাড়ানোর আগেই তার কী ফল হবে আন্দাজ করতে পারে। সৃষ্টিজগতে এই গুণটির যথেষ্ট মূল্য রয়েছে এবং এ জগতে এর অনেক ফলাফলও আছে।

পার্থিব সম্পদ লিপ্সার উর্ধে ওঠাও ঈমানের একটি বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য অর্জিত হলে মানুষ আল্লাহর কাছে যে সম্পদ আছে, যা অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী, তাকেই অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'সে সব জিনিস নিয়েই প্রতিযোগিতা করা উচিত।' আল্লাহর কাছে যে নেয়ামত রয়েছে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করলে মানুষের চরিত্র উন্নত, মহৎ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়। মোমেন যে ময়দানে কাজ করে তার ব্যাপকতাও উক্ত চারিত্রিক গুণ সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে। তার এই ময়দানের সীমানা হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাত এবং পৃথিবী ও উচ্চ দায়িত্বশীল ফেরেশতাদের জগত জুড়ে বিস্তৃত। এ প্রতিযোগিতা চেষ্টা-সাধনার ফলাফল নিয়ে যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এবং ত্বরিত ফলাফল লাভের যে আকাংখা মানুষের মনে থাকে, তাকে প্রশমিত করে আখেরাতের নেয়ামত লাভের প্রতিযোগিতা। কেননা মোমেন সৎ কাজ শুধু এ জন্যে করে যে, তা সৎ কাজ এবং আল্লাহ তায়ালা তা চান। সৎ কাজের উপকারিতা ও কল্যাণকারিতা তার সীমিত ব্যক্তিগত জীবনে চাক্ষুষ সত্য হয়ে প্রকাশিত না হলেও তার কোনো ক্ষতি নেই। কেননা যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সে সৎ কাজ করে, যিনি মারা যান না, ভুলেন না এবং তার কোনো কাজ সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ থাকেন না। পৃথিবী প্রতিদানের জায়গা নয়। পার্থিব জীবন মানুষের জীবনের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ স্তর নয়। এই জ্ঞান ও ঈমানই সেই উৎস, যা থেকে সে সৎ কাজ অব্যাহত রাখার মনোবল ও প্রেরণা লাভ করে। এ উৎস কখনো শূন্য হয় না বা ফুরিয়ে যায় না। এ উৎসই সৎ ও কল্যাণকর কাজকে একটা অব্যাহত ও স্থিতিশীল রীতি হিসাবে বহাল রাখার নিশ্চয়তা দেয়। সৎকাজ নিছক সাময়িক ও মৌসুমী ব্যাপারে পরিণত হয় না কিংবা তা কোনো বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক ঘটনা হয় না। এ জন্যেই মোমেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়নোর প্রচন্ড শক্তি অর্জন করে, চাই সে অন্যায় কোনো খোদাদ্রোহী স্বৈর শক্তির পরিচালিত যুলুম ও সীমালংঘনের আকারে দেখা দিক, অথবা কোন জাহেলী দৃষ্টিভংগির চাপের আকারেই হোক, অথবা মোমেনের নিজের সৎ ইচ্ছার ওপর তার প্রবৃত্তির অন্যায় ঝোঁক ও কামনা-বাসনার চাপের আকারেই হোক বা সেই কামনা-বাসনার বিস্ফোরণ ঘটার আকারেই হোক। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার যে প্রবল চাপ মানুষের ভেতরে সর্বপ্রথম জন্ম নেয়, তা তার এই অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় যে, এই সীমিত আয়ুষ্কালে সে দুনিয়ার সকল আনন্দদায়ক ও মজাদার জিনিস উপভোগ করার এবং তার সকল আশা পূরণের সময় পাবে না। অনুরূপভাবে, এ অনুভূতি থেকেও তা জন্ম নেয় যে, তার সকল সৎ কাজের সুদূরপ্রসারী সুফল সে এই জীবনে দেখার সময় পাবে না এবং বাতিলের ওপর সত্যের বিজয় দেখার সুযোগ পাবে না। ঈমান এই অনুভূতির মৌলিক ও পরিপূর্ণ চিকিৎসা করে। (সূরা 'আল বুরুজের' তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

বস্তুত ঈমান হলো জীবনের প্রধান শেকড় ও উৎসমূল। সততা ও কল্যাণের সকল শাখা-প্রশাখার স্ফূরণ ঘটে এখান থেকেই। এর প্রত্যেক ফলমুল এরই সাথে সংযুক্ত। এর সাথে যে শাখার সংযোগ থাকে না, তা গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। সে শাখা অনিবার্যভাবে শুকিয়ে যাবে ও মরে যাবে। শেকড়ের সাথে যে ফলের সংযোগ নেই, তা শয়তানী ফল, তা কখনো স্থায়ী হয় না।

ঈমানই হলো সেই কেন্দ্রীয় অক্ষশক্তি, যার সাথে জীবনের সকল ঊর্ধগামী সূত্রসমূহ আবদ্ধ। ঈমান না থাকলে জীবনের সকল তৎপরতা, সকল সম্বন্ধসূত্র বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। কোনো কিছুই তা বাঁধতে বা আটকাতে পারবে না। প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীর সাথে তা নিরুদ্দেশের পথে ভেসে যাবে।

ঈমানই হলো সেই মূলনীতি, যা সব কার্যকলাপকে এক সূত্রে গ্রথিত করে, একটা সুসমন্বিত ও সহায়ক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে এবং একটা একক পথে ও একক আন্দোলনে বিলীন করে দেয়। এর একটা সুপরিচিত পরিচালিকা ও প্রেরণাদায়ক শক্তি এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে।

এ জন্যে ঈমানী উৎসের সাথে সংস্রবহীন যে কোনো কাজকে কোরআন নিষ্ফল ও বৃথা গণ্য করে। ইসলামী আদর্শ এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে, তাদের সমস্ত সৎ কাজ সেই ছাইয়ের মত হবে, যা কোনো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনে বাতাসে প্রচন্ড গতিতে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কাফেরদের অর্জিত কোনো সৎ কাজই তাদের উপকারে আসবে না।' সূরা আল নূরে বলা হয়েছে 'যারা কুফরী করেছে, তাদের সৎকর্মসমূহ মরুভূমিতে বিরাজিত মরীচিকার মতো হবে, পিপাসিত ব্যক্তি তাকে পানি মনে করে। পরিশেষে যখন সে তার কাছে উপনীত হয়, তখন সেখানে কোনো বস্তুই পায় না।' কোরআনের এ সব ঘোষণা অকাট্য ভাষায় ঈমানবিহীন যাবতীয় সৎকর্মকে মূল্যহীন, বাতিল ও নিষ্ফল বলে রায় দিয়েছে। কেননা ঈমানই আমলের জন্যে বিশ্বস্রষ্টার সাথে সংযুক্তকারী সংযোগসূত্র এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় বিধানকারী লক্ষ্য সংগ্রহ করে দেয়। যে আকীদা-বিশ্বাস সকল জিনিসকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে ও তাঁর ওপর নির্ভরশীল করে, তার ক্ষেত্রে কোরআনের উক্ত রায় সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সংস্রবহীন হয়, সে তার কাজের প্রকৃত তাৎপর্যই হারিয়ে ফেলে। (১)

এ কথা অকাট্য সত্য যে, ঈমান প্রাকৃতিক বিধি ব্যবস্থার বিশুদ্ধতার পক্ষে এবং মানুষের সৃষ্টির অর্থহীনতার পক্ষে একটি প্রমাণ স্বরূপ। ঈমান এ কথার সত্যতাও প্রমাণ করে যে, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এবং গোটা বিশ্বনিখিলের মাঝে পরিপূর্ণ সমন্বয় বিরাজ করছে এবং মানুষ ও তার পার্শ্ববর্তী সৃষ্টিজগতের মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ সংহতি, একাত্মতা ও ঐকতান। কেননা মানুষ এ বিশ্বেরই অধিবাসী। তার সত্ত্বা যদি সুস্থ ও নিখুঁত থাকে, তাহলে তার মধ্যেও এই বিশ্ব নিখিলের মধ্যে একাত্মতা ও ঐকতান বিরাজ না করে পারে না। আর এই ঐকতান ঈমানের রূপ না নিয়েও পারে না। কেননা খোদ্ এই বিশ্ব নিখিলের মধ্যেই এমন সব সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে, যা এই সুশৃংখল

---

(১) সূরা 'যেলযালের' আয়াত যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও কোনো ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে, আর যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও খারাপ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, 'কোনো কোনো গ্রন্থকার লিখেছেন যে, এ ব্যাপারে সকল মুসলিম আলেমের এজমা (মতৈক্য) হয়েছে যে, কাফেরদের কোনো সৎ কাজই আখেরাতে ফলদায়ক হবেনা এবং তার কোনো অপকর্মের শাস্তিই লাঘব করা হবে না। কিন্তু এই এজমার কোনো প্রমাণ বা ভিত্তি নেই।' এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিষয়টি এজমা থেকে আসেনি, বরং .. এ ঘোষণা থেকে এসেছে যা স্বয়ং স্বপ্রামাণিত সত্য এবং এটা অন্য কোনো প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়।

বিশ্বকে কোনো নমুনা ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজ উদ্ভাবিত নকশা অনুসারে সৃষ্টিকারী এক সর্বশক্তিমান সত্ত্বার সন্ধান দেয়। মানুষ ও বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যখন এই সমন্বয় ও সমতা অনুপস্থিত বা বিকল হয়ে যাবে, তখন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রমাণ করবে যে, এই গ্রাহকযন্ত্রটি অর্থাৎ মানবীয় সত্ত্বার ভেতরেই ত্রুটি ও বৈকল্য বিদ্যমান। এটা এমন এক বৈকল্যের উপস্থিতি নির্দেশ করে, যার পরিণাম ব্যর্থতা ও সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু নয়, আর সেই বৈকল্য ও ত্রুটি সহকারে কোনো কাজই শুদ্ধ হতে পারে না-তা বহিরাবরণে যতোই তার বিশুদ্ধতার প্রলেপ থাক না কেন।

আর মোমেনের ভুবন এতো প্রশস্ত, এতো ব্যাপক, এতো সুপরিসর, এতো উচ্চ, এতো সুন্দর ও এতো সুখ ও সৌভাগ্যমন্ডিত যে, তার পাশে কাফেরদের ভুবন অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বিদঘুটে, অশান্ত দুর্ভাগ্যজর্জরিত বৃথা ও ক্ষতিগ্রস্ত 'সালেহ' হচ্ছে ঈমানের স্বাভাবিক, সহজাত ও স্বয়ংক্রিয় ফল। সৎকর্ম হচ্ছে সেই স্বয়ংক্রিয় গতি বা তৎপরতা যা অন্তরে ঈমানের বীজ উপ্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে যায়। বস্তুত ঈমান হচ্ছে এমন একটি ইতিবাচক চলমান জিনিস, যা মানুষের মনমগযে স্থান লাভ করা মাত্রই তার বাস্তব জীবনে সৎকাজের আকারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৎপর ও সচল হয়ে ওঠে। ইসলামের পরিভাষায় ঈমান এ জিনিসেরই নাম। ঈমান নিশ্চল ও নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকতে পারে না। শুধু মোমেনের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকবে এবং তার বাস্তব জীবনে জীবন্ত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে না–এটাও অসম্ভব। যে ঈমান এই স্বয়ংক্রিয় পন্থায় সঞ্চালিত হয় না, তা নষ্ট, বিকৃত অথবা মৃত। ঈমান ফুলের মতো। সে তার সৌরভকে আটকে রাখতে পারে না। আপনা থেকেই সুগন্ধ ছড়ায়। আর যদি সুগন্ধ না ছড়ায়, তবে বুঝতে হবে, ফুলের অস্তিত্ব নেই।

এখান থেকেই বুঝা যায় ঈমানের মূল্য কতখানি বা ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ কী? ঈমান আল্লাহমুখী গতিশীলতা, তৎপরতা, গঠন ও নির্মাণের সমষ্টি। শুধুমাত্র মন-মগযে ও বিবেকে লুকানো, সংকুচিত, নেতিবাচক জিনিসের নাম নয়। শুধুমাত্র এমন মহৎ উদ্দেশ্য, মনোবাসনা ও পবিত্র নিয়তকে ঈমান বলে না, যা কখনো কাজে পরিণত হয় না। এ হচ্ছে ইসলামের অন্যতম স্বভাব বা প্রকৃতি। ইসলামের এই স্বভাব-প্রকৃতি থেকেই উৎপত্তি হয় জীবনের সর্ব বৃহৎ নির্মাণ-ক্ষমতার।

ঈমান যতক্ষণ আল্লাহর নাযিল করা জীবন বিধানের সাথে সংযোগকে বুঝাবে, ততোক্ষণ উপরোক্ত তত্ত্ব বোধগম্য থাকবে। আর আল্লাহর এই বিধান হচ্ছে সৃষ্টিজগতের অভ্যন্তরে সক্রিয় একটা চিরস্থায়ী ও সুষমামন্ডিত আন্দোলন ও তৎপরতা। এ তৎপরতা একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালিত। এর একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। মানব জাতিকে ঈমানের পথে পরিচালিত করা মূলত বিশ্ব প্রকৃতির স্বভাবসুলভ গতি ও তৎপরতার নিয়মবিধিকেই বাস্তবায়িত করার পথ প্রদর্শনের নামান্তর। সৃষ্টিজগতের সেই স্বাভাবিক গতি ও তৎপরতা হচ্ছে কল্যাণমূলক, গঠনমূলক ও পরিচ্ছন্ন তৎপরতা। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া জীবন বিধানের সাথে তা সামঞ্জস্যশীল ও মানানসই।

মুসলিম জাতির লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি

এরপর সত্য ও ন্যায়ের উপদেশ দান এবং ধৈর্যের উপদেশ দান, এই দুটি বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এর ভেতর দিয়ে মুসলিম জাতির ভাবমূর্তি উচ্চকিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে এমন ইসলামী দল বা সংগঠনেরও ভাবমূর্তি স্পষ্ট হচ্ছে, যার বিশেষ ধরনের কাঠামো, বিশেষ ধরনের সংযোগ কর্মসূচী এবং একটা ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, এমন একটি দলের রূপ কাঠামো তুলে ধরা

হচ্ছে, যে দল নিজের স্বভাব, প্রকৃতিকে যেমন বোঝে, তেমনি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি সে সম্পর্কেও সচেতন। যে দল তার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় ঈমান ও সৎ কাজের প্রকৃত পরিচয় জানে এবং এও জানে যে, ঈমান ও সৎ কর্মের দিকে মানুষকে পরিচালিত করা ও নেতৃত্ব দান করাও তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এ সব বিষয়ে সচেতন বলেই এই সংগঠন নিজের অভ্যন্তরে এরূপ উপদেশের সার্বক্ষণিক আদান-প্রদান চালু রাখে, যাতে সে তার বৃহত্তম দায়িত্ব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ময়দানে নামতে পারে।

সুতরাং 'পরস্পরকে উপদেশ প্রদান' (তাওয়াসাও) বা উপদেশের আদান-প্রদান শব্দটি এই শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য এবং উপদেশ আদান-প্রদানের স্বাভাবিক রূপ ও বাস্তব রূপ এইসব কিছু মিলে মুসলিম উম্মাহ বা ইসলামী সংগঠন বা ইসলামী সমাজের যথার্থ স্বরূপ ও ভাবমূর্তি তুলে ধরে। সেই ভাবমূর্তি এরূপ যে, মুসলিম উম্মাহ, জাতি, সমাজ, দল বা সংগঠন, যাই হোক না কেন, তার সদস্যরা পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ, একাত্ম, কল্যাণকামী, সৎকর্মশীল, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং সেই সংগঠন পৃথিবীতে সত্য, ন্যায়নীতি ও সততার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মনোনীত উম্মাহ হওয়ার জন্যে একটি সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবমূর্তি। ইসলাম চায় মুসলিম জাতি এরকমই হোক। সে চায়, মুসলিম উম্মাহ এরকমই কল্যাণকামী, শক্তিমান, বুদ্ধিমান, সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের প্রহরী হোক। পরস্পরকে সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সৌভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়ে সত্য, সততা, ও ধৈর্যের সদুপদেশ দানকারী হোক, যেমনটি কোরআনের 'তাওয়াসাও' শব্দটি থেকে প্রতিবিম্বিত হয়।

বস্তুত সত্য ও সততার উপদেশের আদান প্রদান একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ। সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কঠিন এবং এর পথে বাধাগুলো হচ্ছে প্রকৃতির কামনা-বাসনা, স্বার্থপ্রণোদিত যুক্তি, পরিবেশগত ধ্যান-ধারণা, স্বৈরাচারী শক্তির আগ্রাসী ও বলপ্রয়োগের মনোবৃত্তি ও যালেমদের যুলুম। 'তাওয়াসাও' বা উপদেশের আদান-প্রদান বলতে বুঝায় স্মরণ করিয়ে দেয়া, উদ্বুদ্ধ করা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে ত্যাগ স্বীকারের চেতনা উজ্জীবন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা করা। এ জিনিসটি মূলত ব্যক্তিগত গুণাবলীর সামষ্টিক রূপ। যখন এগুলো একত্রে কর্মতৎপর হয়, তখন এর শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কারণ সত্য ও ন্যায়ের প্রত্যেক প্রহরীর মনে এই অনুভূতি থাকে যে, তার সাথে আরো অনেকে আছে, যারা তাকে সদুপদেশ দেয়, উৎসাহ যোগায়, সহযোগিতা দেয়, ভালোবাসে এবং অবজ্ঞা বা অসম্মান করে না। বস্তুত এই সত্য দ্বীন ঠিক এই ধরনের একটি দলের সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রহরা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যার কর্মীরা পরস্পরের সহযোগী, সমব্যথী, সমমনা, একাত্ম, সুসংগঠিত, পরস্পরকে উপদেশ দানকারী ও নিরাপত্তা দানকারী হয়।

একইভাবে ধৈর্যের জন্যে উপদেশ বিনিময়ও একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। ঈমান ও সৎকর্ম চালু রাখা এবং সত্য ও ন্যায়ের সংরক্ষণ ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ। আর এ জন্যে ধৈর্য অপরিহার্য। নিজের প্রবৃত্তির সাথে জেহাদ এবং অপরের সাথে জেহাদ, উভয় জেহাদের জন্যেই ধৈর্য প্রয়োজন। বাতিলের অগ্রগতি ও দুষ্ট লোকদের আংগুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখেও ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন। সত্যের পথের দীর্ঘতা ও বিভিন্ন স্তর পার হতে বিলম্ব ঘটার ক্ষেত্রেও ধৈর্যের প্রয়োজন। সত্যের ব্যাপারে বিশ্ববাসীর অসারতা ও দুঃসময়ের অবসানে বিলম্বেও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার উপদেশ আদান-প্রদানে কর্মক্ষমতা বাড়ে। কেননা এতে লক্ষ্যের ঐক্য, দৃষ্টিভংগির ঐক্য, সকল মোমেনের সমর্থন ও সহায়তা,তাদের দৃঢ় সংকল্প, ভালোবাসা ও ক্রমাগত চেষ্টা সাধনার যোগ্যতারূপী সম্পদ অর্জিত হয়, অনুরূপভাবে ইসলামী সমাজ বা সংগঠনের বহু প্রয়োজনীয় মহৎ গুণ ধৈর্যের উপদেশ দানের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। যে পরিবেশে সেইসব গুণের প্রসার ঘটে, ইসলামের সত্যিকার রূপ সেই পরিবেশেই বিকশিত ও প্রকাশিত হয়। তাই ধৈর্যের উপদেশের ব্যাপক আদান-প্রদান ছাড়া ব্যর্থতা অনিবার্য।

মুসলমানদের অধপতনে মানবজাতি যে ক্ষতির সম্মুখিন

পবিত্র কোরআন এই সূরায় ব্যর্থতা ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যে সংবিধান দিয়েছে, সেই সংবিধানের নিরিখে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, ব্যর্থতা আজ সারা পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতিকে গ্রাস করেছে। এই ব্যর্থতা থেকে পৃথিবীর কোনো অংশই নিস্তার পায়নি। এই দুনিয়াতে মানবজাতি যে যুলুমের শিকার, তা দেখলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। মানবজাতি যেভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে চলেছে, আর তার পাশাপাশি পৃথিবী থেকে সত্যপন্থী কল্যাণকামী ইসলামী সরকারের অনুপস্থিতি পরিস্থিতিকে যেভাবে অধিকতর বিপজ্জনক করে তুলেছে, তা যথার্থই ভীতিপ্রদ। এছাড়া আরো বিপজ্জনক ব্যাপার এই যে, মুসলমানরা বা সঠিকভাবে বলতে গেলে মুসলিম দাবীদাররাই আজ এই কল্যাণময় সত্য দ্বীন থেকে সবচেয়ে বেশী দূরত্বে অবস্থিত। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে জীবন বিধান মনোনীত করেছেন, তাকে তারাই সবচেয়ে বেশী অবজ্ঞা করে চলেছে। মুসলিম উম্মাহর জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে সংবিধান রচনা করে দিয়েছেন, ব্যর্থতা ও ক্ষতি থেকে মুক্তি লাভের জন্যে যে একমাত্র পথটি দেখিয়েছেন, তাকে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশী উপেক্ষা করে চলেছে। আর পৃথিবীর যে স্থানগুলো থেকে এই কল্যাণময় ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ফুটে বেরিয়েছিলো, সে সব স্থানের অধিবাসীরা তাদের পতাকা বেশী করে পরিত্যাগ করেছে। অথচ ওই ঈমানী পতাকা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাদের জন্যে উড্ডীন করেছিলেন। অথচ সব অঞ্চলের জনগণ নিজেদেরকে এমন সব জাতিগত পতাকার সাথে সংযুক্ত করতে শুরু করেছে, যে পতাকার অধীনে ওইসব অঞ্চল তাদের ইতিহাসে কখনো কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি এমনকি সেসব অঞ্চল সে পতাকার অধীনে কখনো কোন সুনাম ও সুখ্যাতি লাভ করেনি। বরং একমাত্র ইসলাম এসেই তাদের জন্যে একক, লা-শরীক আল্লাহর মনোনীত পতাকা এবং একক লা-শরীক আল্লাহর নামাংকিত পতাকা উত্তোলন করেছে। সে পতাকা ছিলো আল্লাহর প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত। সেই পতাকার অধীনেই আরব জাতি বিজয় অর্জন করে, শুধু আরব ইতিহাসে নয় বরং সমগ্র মানবেতিহাসে এই পতাকাই সর্বপ্রথম মানবজাতিকে কল্যাণময়, শক্তিমান, বিচক্ষণ ও স্বাধীন নেতৃত্ব উপহার দেয়।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী 'মুসলিম জাতির অধপতনে বিশ্বের কি ক্ষতি হয়েছে' নামক অনবদ্য গ্রন্থে সমগ্র ইতিহাসের এই নযীরবিহীন কল্যাণকামী নেতৃত্ব সম্পর্কে 'ইসলামী শাসনের যুগ, মুসলিম শাসকগণ ও তাদের বৈশিষ্ট' শিরোনামে বলেন,

'মুসলমানরা বিজয়ী হয়, বিশ্বের নেতৃত্ব হস্তগত করে এবং বিকারগ্রস্ত ও দুর্নীতিবাজ জাতিগুলোকে মানবজাতির নেতৃত্ব থেকে উৎখাত করে। এই নেতৃত্বকে তারা অন্যায়ভাবে কবযা করেছিলো এবং তার অপব্যবহার করেছিলো। মুসলমানরাই মানব জাতিকে ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফপূর্ণ শাসন উপহার দিয়েছিলো। বিশ্ব-নেতৃত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় গুণাবলী তাদেরই ছিলো। নিজেদের নেতৃত্বে ও তদারকীতে তারা বিশ্বের সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ নিশ্চিত করেছিলো। সেই গুণগুলো ছিলো নিম্নরূপ,

প্রথমত তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কেতাব ও শরীয়তের অধিকারী ছিলো। ফলে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো আইন রচনা করেনি। কেননা মানব রচিত আইন অজ্ঞতা, ভুলভ্রান্তি ও যুলুমের উৎস। মুসলিম শাসকরা নিজেদের ব্যবহারে, রাজনীতিতে ও মানুষের সাথে লেনদেনে উচ্ছৃংখল ও এলোমেলো আচরণ করতেন না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মানুষের সাথে আচরণের জন্যে আলো এবং মানুষকে শাসন করার জন্যে শরীয়তী বিধান দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, মৃত ব্যক্তিকে আমি জীবিত করেছি এবং মানুষের ভেতরে চলাফেরার জন্যে আলো দিয়েছি, সে কি সেই ব্যক্তির মতো, যার উদাহরণ অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে এবং সেখান থেকে বের হবে না?' আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন, হে মোমেনরা! তোমরা ন্যায়বিচারের সাক্ষী হয়ে আল্লাহর জন্যে স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান হও। কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ ত্যাগ করতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার করো। আল্লাহভীতির সাথে এর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন।'

দ্বিতীয়ত নৈতিক প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা না করে তারা নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেনি, যেমনটি অধিকাংশ জাতি, ব্যক্তি ও শাসকরা অতীতেও করেছে বর্তমানেও করেছে ও ভবিষ্যতেও করে করবে। তারা দীর্ঘদিন মোহাম্মদ (স.)-এর হাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, তাঁর সূক্ষ্ম নিখুঁত তদারকী,পরিশুদ্ধি ও পরিমার্জনের সুযোগ পেয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে দুনিয়ার স্বার্থ বর্জন, পরহেযগারী, আমানতদারী, অন্যকে অগ্রাধিকার দান, আল্লাহর ভয় এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রার্থী ও প্রত্যাশী না হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো। রসূল (স.) বলেন, 'আল্লাহর কসম, এই কাজের দায়িত্ব আমরা যে চায় তাকেও দেই না, যে এর আকাংখা পোষণ করে তাকেও দেই না।' (বোখারী ও মুসলিম)।

আর এ কথা তো তাদের কানে দিন-রাত অনুরণিত হয়ে থাকে যে, 'আখেরাতের সেই ঘর (জান্নাত) আমি সেইসব লোকের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়াই যাহির করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও ইচ্ছুক নয়। আর পরিণামের চূড়ান্ত কল্যাণ শুধু পরহেযগার লোকদের জন্যেই।' আমীরত্বের পদের জন্যে প্রার্থী হওয়া, তদবীর সুপারিশ করা, প্রচারণা চালানো এবং তার জন্যে টাকা ব্যয় করা তো দূরের কথা, পদ ও চাকরীর জন্যে তারা ধরনাও দিতেন না। এতদসত্ত্বেও যখন জনগণের কোনো দায়িত্ব তাদের কাছে ন্যস্ত হতো, তখন সেটিকে তারা স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করতেন না কিংবা ইতিপূর্বে যে সম্পদ ও চেষ্টা-সাধনা তারা ইসলামের জন্যে ব্যয় করেছেন, তার মূল্য গ্রহণ করার জন্যেও তারা কোন চেষ্টা করেননি। তারা এই পদমর্যাদাকে আমানত হিসাবে এবং আল্লাহর পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তারা জানেন যে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে (হিসাব না দিয়ে) এক পাও নড়তে দেবেন না এবং ছোট-বড় প্রতিটি কাজের জন্যে তারা জবাবদিহি করতে বাধ্য। তারা সব সময় আল্লাহর এই বাণী স্মরণ রাখে যে, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন আমানতগুলোকে যারা তার উপযুক্ত, তাদের কাছে সমর্পণ করবে, আর মানুষের ভেতরে যখন বিচার শাসন করবে, তখন ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বিচার-শাসন করবে।' তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন এবং তোমাদের কিছু লোককে অপর কিছু লোকের ওপর মর্যাদা দান করেছেন, যাতে তোমাদেরকে দেয়া সম্পদের ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন।'

তৃতীয়ত, তারা কোনো গোষ্ঠীবিশেষ ও জাতি বিশেষের সেবক ও দূত ছিলেন না যে, শুধু সেই বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতির কল্যাণ ও সুবিধার জন্যেই তারা চেষ্টা করবেন। তারা নিজেদের জাতিকে দুনিয়ার সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না। তারা নিজেদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতেন না যে, তাদের সৃষ্টিই হয়েছে শাসক হবার জন্যে এবং অন্য জাতিগুলোর সৃষ্টিই হয়েছে মুসলমানদের পদানত হয়ে থাকার জন্যে। তারা কোনো আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেননি, যাতে তার মাধ্যমে নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধি ও ফুলে-ফেঁপে ওঠার ব্যবস্থা হয়, অহংকার ও গর্বে মেতে ওঠার সুযোগ হয় এবং জনগণ পারস্য ও রোমের পরিবর্তে আরব সাম্রাজ্যের গোলাম হয়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে সৃষ্টির গোলামী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলাম বানানো। মুসলমানদের দূত রাবয়ী বিন আমের পারস্য সম্রাট ইয়াজদগারের দরবারে বলেছিলেন, 'আমরা এসেছি মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্বের আওতাভুক্ত করার জন্যে, পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে প্রশস্ততায় আনার জন্যে এবং বিভিন্ন ধর্মের যুলুম থেকে ইসলামের ন্যায়বিচারের অধীনে আনার জন্যে।' (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)।

বস্তুত মুসলমানদের চোখে সকল জাতি ও সকল মানুষ সমান ছিলো। সকল মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। কোনো অনারবের ওপর আরবের এবং কোনো আরবের ওপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ তায়ালা বলছেন হে মানুষেরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি রূপে বানিয়েছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের ভেতরে যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার, সেই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত।'

মিসরের গভর্ণর আমর ইবনুল আস-এর ছেলে যখন জনৈক মিসরীয় নাগরিককে প্রহার করে গর্বের সাথে বলেছিলো, 'এ প্রহার দুই সম্ভ্রান্ত নারী ও পুরুষের পুত্রের পক্ষ থেকে মেনে নাও,' তখন হযরত ওমর তার কাছ থেকে প্রতিশোধ আদায় করলেন এবং বললেন, 'জনগণ তো তাদের মায়ের গর্ভ থেকে স্বাধীন ভাবেই জন্মেছিলো, তোমরা আবার কখন তাদেরকে গোলামে পরিণত করলে?' বস্তুত মুসলিম শাসকরা তাদের জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতা এবং মর্যাদা দানে তারা কোনো বংশ, বর্ণ ও জন্মভূমির ভেদাভেদ করেননি। তারা ছিলেন মেঘমালার মতো। সকল দেশের ওপর সংগঠিত হয়ে এসেছেন, সকল মানুষকে সমভাবে অনুগ্রহ বিতরণ করেছেন, উপত্যকা ও মরুভূমির লোকেরা তাদের প্রশংসা করেছে, কিন্তু তা দ্বারা বিভিন্ন মানুষ ও বিভিন্ন দেশ উপকৃত হয়েছে নিজ নিজ যোগ্যতার ভিত্তিতে।

তাদেরই নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে বিভিন্ন জাতি, এমনকি ইতিপূর্বে যারা নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়েছে তারাও-ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সত্যতা ও শাসন ক্ষমতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে এবং নতুন বিশ্ব গড়ার ব্যাপারে আরবদের সহযোগিতা করেছে। এমনকি বিভিন্ন শাসিত অনারব জাতির লোকেরা স্বয়ং শাসক আরব জাতির চেয়েও কোনো কোনো বিষয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করেছে। কেউ কেউ আরবদের মাথার মুকুটও হয়ে গেছে এবং মুসলিম জাতির সার্বজনীন নেতা, ইমাম, ফকীহ ও মোহাদ্দেস হয়েছে।

চতুর্থত মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি। তার মন আছে, জ্ঞান মস্তিষ্ক আছে, অংগপ্রত্যংগ আছে এবং রকমারি আবেগ-অনুভূতি আছে। তার এই সকল শক্তি সমানুপাতিক হারে ও সুসমন্বিতভাবে বিকাশ লাভ না করলে এবং উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টি না পেলে মানুষ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারে

না এবং সে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে উন্নতি করতে পারে না। একটি ন্যায়সংগত সভ্যতার প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব, যখন ধর্মীয়, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তির ও শারীরিক সর্বক্ষেত্রে মধ্যম ধরনের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মানুষ তার অধীনে তার মানবীয় পূর্ণতা সহজেই অর্জন করতে পারবে। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ কাজটি তখনই সম্ভব, যখন সামাজিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব এমন লোকদের হাতে থাকবে, যারা আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা উভয়টিতেই বিশ্বাসী হবে, যারা ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে পরিপূর্ণ আদর্শ হবে, সুস্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হবে এবং কার্যকর ও লাভজনক জ্ঞানের অধিকারী হবে। অতপর 'খেলাফতে রাশেদার যুগ ন্যায়নিষ্ঠ সভ্যতার আদর্শ' শিরোনামে তিনি বলেনঃ

'খেলাফতে রাশেদা এ রকমই ছিলো। সমগ্র ইতিহাসে আমরা খেলাফতে রাশেদার চেয়ে সর্বশক্তি দিয়ে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও পূর্ণাংগ কোনো যুগ খুঁজে পাই না। আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বস্তুগত উপায়-উপকরণ-এই সব কিছুই পূর্ণাংগ মানুষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ সত্যতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এই সরকার ছিলো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সরকার এবং তৎকালে সকল রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সেরা শক্তি। সে সময় উচ্চতম নৈতিক মানের প্রাধান্য সাধারণ মানুষের জীবনে ও শাসন ব্যবস্থায় সমভাবে বিদ্যমান ছিলো। নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও শিল্পেরও উন্নয়ন সাধিত হচ্ছিলো। আর দেশ জয় ও সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে একই পর্যায়ের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির কাজ চলতো। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন ও লোকসংখ্যা অনুপাতে অপরাধের মাত্রা কমে গিয়েছিলো, যদিও অপরাধের উপকরণাদি নেহাৎ কম ছিলো না। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে সমাজের এবং সমাজের সাথে ব্যক্তির চমৎকার সুসম্পর্ক বিরাজ করতো। আর এটা এমন একটা পুর্ণাংগ স্তব, যার চেয়ে উন্নত স্তর, সুন্দর অবস্থা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

ইসলামী সংবিধানের অধীনে মানবজাতির যে সুখসময় যুগটা কেটেছে, এখানে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো। সূরা 'আল আসরে' এই সংবিধানের মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। মানবজাতি এ সুখময় যুগটা কাটাতে পেরেছিলো সেই ঈমানী পতাকার নিচে সমবেত হয়ে, যা বহন করেছিলো ঈমান, সৎসর্গ, সততা ও সত্যের জন্যে পারস্পরিক উপদেশের আদান-প্রদান এবং ধৈর্যের জন্যে পারস্পরিক উপদেশের আদান-প্রদানকারী একটি ইসলামী সংগঠন।

সেই সুখময় যুগ ও পরিবেশের সাথে আজকের সর্বব্যাপী ক্ষয়ক্ষতির কি তুলনা হতে পারে, যা দ্বারা মানবসমাজ পৃথিবীর সর্বত্র জর্জরিত, যা ন্যায় ও অন্যায় এবং সততা ও অসততার সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানব জাতিকে প্রতিনিয়ত সর্বস্বান্ত করছে। কি যুক্তি থাকতে পারে আজকের মানবসমাজ কর্তৃক তৎকালীন আরবজাতির সাধিত বিরাট জনকল্যাণমুখী কীর্তিকে অন্ধ বিদ্বেষের তাড়নায় অস্বীকার ও উপেক্ষা করার পেছনে? সেদিন আরব জাতি ইসলামের পতাকা উড়িয়ে এই অকল্পনীয় কীর্তি সমাধা করতে পেরেছিলো বলেই তার হাতে এসেছিলো মানবজাতির নেতৃত্বের চাবিকাঠি। তারপর যেই সে পতাকা নামালো, অমনি তার স্থান হলো কাফেলার একেবারে পেছনের কাতারে। তারপর গোটা কাফেলাই ধ্বংস ও পতনের শিকার হলো। আর সকল পতাকা হয়ে গেলো শয়তানের পতাকা। একটি পতাকাও আল্লাহর রইলো না। সকল ঝান্ডা উড়তে

লাগলো বাতিলের পক্ষে। একটি ঝান্ডাও সত্যের পক্ষে উড্ডীন থাকলো না। সকল পতাকা রইলো অন্ধত্ব ও গোমরাহীর পক্ষে। হেদায়াত ও আলোর পক্ষে কোনো পতাকা রইলো না। সকল পতাকা রইলো ক্ষতি ও ধ্বংসের। সফলতা ও কল্যাণের কোনো পতাকা রইলো না। অথচ আল্লাহর পতাকা এখনো বিদ্যমান। শুধু অপেক্ষায় আছে কোন হাত তা বহন করার জন্যে এগিয়ে আসে তা দেখার জন্যে। আর কোন জাতি তার অধীনে হেদায়াত, কল্যাণ, সততা ও মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের অভিযানে অভিযাত্রী হতে ইচ্ছুক।

পৃথিবীতে লাভ ও ক্ষতির এই হচ্ছে অবস্থা। তবে আখেরাতের লাভক্ষতির তুলনায় দুনিয়ার লাভক্ষতি নিতান্তই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ব্যাপার। আখেরাতের লাভ ও সাফল্য সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। সেখানে ক্ষতি হলে তাও ন্যায়ভিত্তিক। সেখানে লাভ বা ক্ষতি যেটাই হোক, দীর্ঘমেয়াদী, চিরস্থায়ী এবং বাস্তব। সেখানকার লাভ অর্থই বেহেশ্‌ত ও আল্লাহর সন্তোষ লাভ। আর ক্ষতি মানেই বেহেশ্‌ত ও আল্লাহ সন্তোষ খোয়ানো। সেখানে মানুষ হয় সর্বোচ্চ পর্যায়ের পূর্ণতা ও মর্যাদা লাভ করবে, নচেৎ সর্বনিম্ন পর্যায়ের অবমাননা ভোগ করবে, ফলে তার মনুষ্যত্বের এত অধোপতন ঘটবে যে, মানুষ মর্যাদার দিক দিয়ে পাথরের পর্যায়ে নেমে যাবে, কিন্তু শান্তির দিক দিয়ে সে পাথরের চেয়েও নিচে নেমে যাবে। অর্থাৎ পাথর যতটুকু শান্তি ভোগ করতে পারবে, সে তাও পারবে না। আল্লাহ বলেন, 'সেদিন মানুষ নিজের কৃতকর্মের দিকে তাকাবে। আর কাফের বলবে, আহা আমি যদি পাথর হয়ে যেতাম!'

এই সূরাটি মানুষের জীবন-পথ নির্ণয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সে বলেছে একমাত্র 'ঈমান, সৎ কাজ, সত্যের উপদেশ আদান-প্রদান ও ধৈর্যের উপদেশ আদান-প্রদানেই সফলতা। এছাড়া আর সব কিছুতেই ব্যর্থতা ও ক্ষতি। পথ মাত্র একটাই। একাধিক নয়। ঈমান, সততা ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা, যা সততা ও সত্যের উপদেশ প্রদান করবে এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সত্যকে সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেবে।

এ পথ একই পথ। এ কারণে রসূল (স.)-এর আমলে দু'ব্যক্তি একত্রে মিলিত হলে তারা বিচ্ছিন্ন হবার আগে একে অপরকে সূরা আল আসর পড়ে শুনাতে ভুল করতো না। এটা শুনানোর পরেই পরস্পরকে বিদায়ী সালাম করতো। তারা আল্লাহর এই সংবিধান মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলো। ঈমান ও সৎ কাজে অংগীকারাবদ্ধ ছিলো। সত্যের উপদেশ ও ধৈর্যের উপদেশ আদান-প্রদানে সংকল্পবদ্ধ ছিলো। এই সংবিধানকে রক্ষা করতে তারা বদ্ধপরিকর ছিলো। এই সংবিধান পালনকারী উম্মাহর সদস্য থাকতে চুক্তিবদ্ধ ছিলো।